Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 355 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 355 - 361
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

হাসান আজিজুল হকের শিশুসাহিত্য : একটি আলোচনা

আলোকপর্ণা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত
Email ID : alokparnas@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Hasan Azizul Haque, children, literature, humor, social, stories, novel, moral.

Abstract
Hasan Azizul Haque, who was born on 2 February 1939 and died on 15 November 2021, was an eminent writer from Bangladesh who has written famous short stories and novels regarding Bengal partition and liberation war, his stories and novels are very much popular in both India and Bangladesh, but it is a lesser-known fact that he has written very few (only 7) short stories and a novel for the children too. His seven short stories and novel for children is a blend of humor, laughter and social reflection, because as a socially sound writer he wanted to make them face the reality. But keeping in mind that he was writing for children, he made such characters, that some of them will make children laugh as well as some of them will make them learn something. The stories and the novel have such wonderful tales of timeless relationships, suspense, fighting for living and pandemonic situations. Every single tale has its own wonder, somewhere there is a battle of jealousy, somewhere, the strength of friendship between a boy and an animal conquers all the odds against them. Somewhere we can see a hilarious situation regarding a hunting, in some story it will be seen that how much fool a person can be, in another story a journey will be described through the eyes of an animal. Here, not only the humans, but also the animals will give some subtle messages. These various tastes will make the children feel the real essence of life. As a writer he has successfully fulfilled his responsibility to blend his writings as per the children. Though the young readers haven't got so much writings for them from his side, but how much they have got, it is obvious that along with them, the grown-ups will also enjoy those writings.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে যাঁরাই দিকপাল লেখক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই লেখক জীবনের কোন না কোন সময়ে শিশু-কিশোরদের জন্য কলম ধরেছেন। তাঁরা যতই প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য লেখক হন না কেন, শিশুদের জন্য অল্প হলেও তাদের মণি-মাণিক্যস্বরূপ রচনা রয়ে গেছে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে— শিশুরা আসলে চিরপুরাতন, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যেও একজন শিশু বাস করে। বড়রা আসলে তাদের শৈশবটাকে ফিরে পেতে চায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার আড়ালে। আজকালের এই ব্যস্ততম যুগে যেখানে একটি শিশুকেই নিজের শৈশব খুঁজে পেতে হিমশিম খেতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 355 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়, সেখানে বড়রা, যারা অনেক দূরে ফেলে এসেছে তাঁদের ছোটবেলাকে, শিশুসাহিত্য যেন তাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের জন্য লেখা যেমন শিশুদেরও উপভোগ্য, তেমনই যারা শৈশবকে খুঁজছে তাদের জন্যও উপভোগ্য। বিখ্যাত লেখক হাসান আজিজুল হককে বলা যায় একজন আদ্যন্ত সিরিয়াস লেখক। তিনি যে যে বিষয়ে গল্প–উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, বা বলা যায় ঠিক শিশুদের জন্য নয়, যেমন— মুক্তিযুদ্ধ, দেশভাগ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। তাঁর কয়েকটি গল্পে কিশোর চরিত্ররা থাকলেও সহজেই বোঝা যায় যে, গল্পগুলি ঠিক শিশু-কিশোরদের জন্য নয়। কিন্তু হাসান আজিজুল হকের মতো সিরিয়াস লেখকও অত্যন্ত অল্প হলেও আদ্যন্ত ছোটদের জন্যই কলম ধরেছেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘লাল ঘোড়া আমি’ নামক কিশোর উপন্যাস আর সাতটি গল্পে। এই সাতটি গল্প হল— ‘ফুটবল থেকে সাবধান’, ‘হেমাপ্যাথি, এলাপ্যাথি’, ‘ভূতে বিশ্বাস নেই’, ‘গজভুক্তকপিত্থ’, ‘লড়াই মানে ফাইট’, ‘চরু’ আর ‘ব্যাঘ্রবধের ব্যাপার’। শিশু-কিশোরদের জন্য হাসান আজিজুল হকের রচনা বলতে এটুকুই, সাতটি কিশোর গল্প ও একটি কিশোর উপন্যাস।

এই সাতটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে, ‘ফুটবল থেকে সাবধান’ নামক একটি ছোট গল্পগ্রন্থে। সাতটি গল্প সমন্বিত এই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করেছিল ঢাকার অবসর প্রকাশনা সংস্থা। আর ‘লাল ঘোড়া আমি’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে, শিশু একাডেমী থেকে। একথা বলতেই হয় যে, হাসান আজিজুল হক আদ্যন্ত বাস্তবের মাটিতে পা রাখা একজন লেখক। একজন লেখক হিসেবে পাঠককে বাস্তব থেকে সরিয়ে কল্পরাজ্যে রাখা তাঁর কখনোই নীতি নয়। তিনি মনে করতেন এই কাজ করলে পাঠকের প্রতি লেখক হিসেবে অবিচার করা হয়। তাই তার রচনায় দেখা যায় বাস্তবের কঠিন চিত্র। যা হয়তো অনেক সময় পাঠকের পক্ষে আত্মস্থ করা কষ্টকর, কিন্তু লেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হক মিথ্যা কল্পনা তাঁর পাঠকদের জন্য সাজাতে পারেন না। শিশুদের ক্ষেত্রেও তিনি সেই নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সচেতনভাবে শিশুদের মতো করে তাদের জন্য লিখেও, বাস্তবের ছোঁয়া তিনি তাঁর লেখনীতে রেখেছেন। সে বাস্তব বলাই বাহুল্য শিশুদের নয়, বড়দের কঠিন বাস্তব। হয়তো সেই কারণেই গল্পগুলি শিশু ও বড়, উভয়ের কাছেই সুখপাঠ্য হয়েছে।

‘ফুটবল থেকে সাবধান’ গল্পটি ভল্টু, পল্টু, লেদু আর ফটিকবাবুর গল্প। এই গল্পটি যেন একখণ্ড ছোটবেলাকে মনে করিয়ে দেয়। যে ছোটবেলা ছিল কেবল খেলার মাঠে বল তাড়া করার আর মাস্টার মশাইয়ের অঙ্ক কষার ভয়ে অসুখের ভান করে শুয়ে থাকার ছোটবেলা। এখনকার এই ব্যস্ত জীবনে আর ততোধিক ব্যস্ত শৈশবে সেই সব দিনের কথা শোনাই যায় না। গল্পে ফুটবল খেলতে গিয়ে লেদুর শটে ভল্টুর পা ভয়ানক ভাবে মচকে যায়। বাবার ভয়ে ব্যথার কথা কাউকে বলতে না পেরে ভল্টু অ্যালজেব্রা কষার ভান করে ঘরবন্দি থাকতে চায়, কিন্তু স্কুল যেতেই হবে তাই কোনোক্রমে বাবার চোখ বাঁচিয়ে লেদুর কাঁধে চড়ে স্কুলে পৌঁছালেও সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ফটিকবাবুর দেওয়া অ্যালজেব্রার অঙ্ক। কারণ অ্যালজেব্রা না পারলে ফটিকবাবু ভল্টুর শোচনীয় দশা করবেন। এই ঘটনা, এই গল্প মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের। ছোটবেলায় এমন অনেক দিন অনেকেরই গেছে যেদিন পড়া না হওয়ার ভয়ে স্কুলমুখো হতে মন চায়নি। যাই হোক। এবার শুরু হয় আসল গল্প। সব বন্ধুদলের মধ্যেই একটি করে যেমন অতিরিক্ত দুষ্ট বন্ধু থাকে, এই গল্পে সে হচ্ছে পল্টু। যাতে সেদিনের মতো অ্যালজেব্রার হাত থেকে বাঁচা যায়, সেই জন্য দুষ্টামি করে সে ফটিকবাবুর বর্তুলাকার পেটেই বল মারায় লেদুকে দিয়ে। কিন্তু এরপরেই তারা দেখতে পায় ফটিকবাবুর আসল রূপ। যে রূপ তারা আশা করেছিল সেই রূপ নয়, বরং এক অন্য রূপ। এই গল্প যেন শিক্ষক আর ছাত্রের এক চিরকালীন সম্পর্কের গল্প বলে। ফটিকবাবু সেই শিক্ষক, যার বকার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য ও অপরিসীম ভালোবাসা। যে ফটিকবাবু একবার বলেন—

> “আজ সারাদিন শুধু অ্যালজেব্রার ক্লাস হবে,”[১]

আবার পরমুহূর্তেই বলেন—

> “হতভাগা পা-টার দশা করেছে কী- চিরদিনের মতো খেলাধুলো যে যাবে- যা ভাগ।”[২]

তাঁর ছাত্র-প্রীতি যে প্রশ্নাতীত, একথা বলাই বাহুল্য। আসলে বড়রাও শিশুকাল পেরিয়ে আসেন আর নিজের অজান্তেই শৈশবের পিছনে ছোটেন। তাই হয়তো ফটিকবাবুর তিন ছাত্র তাকে ফুটবল মেরে রীতিমতো আহত করলেও তিনি বলেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 355 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দেখে আয়গে ইসলামপুর স্কুলের টিমে আমার নাম লেখা আছে সোনার কালিতে।"[৩]

ঠিক যেমন সুকুমার রায়ের 'আজব সাজা' গল্পে পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের বকতে গিয়েও বকেন না নিজের কোন এক দুষ্টামির কথা মনে পড়ে যাওয়ায়।[৪] এভাবেই এক সুন্দর ও মূল্যবান শৈশবচিত্র ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক লেখক তুলে ধরেছেন গল্পে যা সত্যিই আজকের দিনে হয়তো দুর্লভ।

'হেমাপ্যাথি, এলাপ্যাথি' গল্পটি দুই ডাক্তারের রেষারেষির গল্প। এই রেষারেষি যেমন হাসির উদ্রেক করবে, তেমনই মনও আর্দ্র করবে। কারণ এই কাহিনিতে হাসির মোড়কে লেখক তুলে ধরেছেন তৎকালীন গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার জীর্ণতাকে আর হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথির চিরকালীন দ্বন্দ্বকে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার জীর্ণতা প্রথমেই বোঝা যায় দুই ডাক্তারের ওষুধ দেওয়ার ধরণ ও বর্ণনায়। তারা সেই রকম ডাক্তার, যেটিকে এখনকার ভাষায় হাতুড়ে ডাক্তার বা কোয়াক বলা হয়। পেটের ভিতর শব্দ হওয়াকে যে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বর্ণনা করেন— "ব্যাং ডাকে গোঁ গোঁ করে,"[৫] তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা যে কতটা গভীর তা সহজেই অনুমেয়। আর যে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার কোন এক বড় ডাক্তারের হুঁকো পরিষ্কার করতেন প্রথম জীবনে আর যার ওষুধ খেয়ে মানুষ চিরকালের মতো খঞ্জ ও বধির হয়ে যায়, তাঁর বিদ্যাও যে তথৈবচ একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সমগ্র গল্প জুড়ে দুই ডাক্তারের রেষারেষি, পরস্পরের প্রতি তাঁদের বাক্যবাণ বর্ষণ ও সর্বোপরি রোগী ধরে রাখতে চাওয়ার কলাকৌশল নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। গল্পে হোমিওপ্যাথ অঘোর ডাক্তার আর অ্যালোপ্যাথ তোরাপ ডাক্তার যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁদের প্রতি গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। সেটা গ্রামের লোকেদের কাছে পরস্পরের ঘোরতর নিন্দা করেই হোক বা ভুল ওষুধের অতি-প্রয়োগ করেই হোক। এর থেকেই বোঝা যায় যে গ্রামের মানুষদের সুস্বাস্থ্য তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য হল নিজেদের প্রচার। তাই মানুষের রোগ ও অসহায়তাকে পুঁজি করেই তাঁরা কখনো হয়তো স্রেফ টিউবয়েলের জলে স্পিরিট মিশিয়ে ওষুধ হিসেবে রোগীকে দেন, আবার কখনো ম্যালেরিয়া জ্বরের এমন ট্যাবলেট দেন যার ফলশ্রুতিতে রোগী খঞ্জ বা বধির হয়ে যায়। কিন্তু এই কাহিনিতেই ধীরে ধীরে দেখতে পাই এক মোচড়, যা খুবই সূক্ষ্ম। ম্যালেরিয়া সারাতে অ্যালোপ্যাথিই ভরসা, তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই গ্রামবাসীরা অ্যালোপ্যাথ তোরাপ ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসা করাতে যায়। আর তোরাপের বাড়বাড়ন্তে ঈর্ষান্বিত হয়ে হোমিওপ্যাথ অঘোর ডাক্তার তোরাপের ডাক্তারিতে বাধা সৃষ্টি করতে শহর থেকে নিয়ে আসেন কুইনাইনের ইঞ্জেকশন, যদিও তিনি ইঞ্জেকশন দিতে জানেন না। এই ইঞ্জেকশন দিতে না জেনেও কেবলমাত্র জেদের বশে ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে রোগীর প্রাণ নিয়ে খেলার সময়েই ধরা পড়েছে অঘোর ডাক্তারের অন্তরের টানাপড়েন। ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে পা কেঁপে যাওয়া, নিজের মনের জোর অহেতুক বাড়ানোর জন্য স্বগতোক্তি করা ইত্যাদি থেকেই ধরা পড়ে যায় অঘোর ডাক্তারের আত্মবিশ্বাসের অভাব, সেটা আরো ভালো করে পাঠকের কানে বাজে রোগী ইদরিসের কথায়—

> "কাউকে ধরতে হবে না ডাক্তারবাবু- আপনি ইনজিশন দ্যান- বরঞ্চ আপনাকে ধরতে হলে ওদেরকে বলুন।"[৬]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই টানাপড়েনে হার হয় অঘোর ডাক্তারের। ইদরিসের কোমরে অনভ্যস্ত হাতের ইঞ্জেকশনের সূচ ভেঙে যাওয়া আসলে অঘোরের মনোবল, গ্রামের মানুষের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি, রোগীর প্রাণের মূল্য, আর তোরাপের কাছে নিজের গুমোর, সব কিছুরই একসঙ্গে ভেঙ্গে যাওয়া। ডাক্তার হওয়ার যে সামান্য মূল্যবোধ অজান্তেই বাসা বেঁধেছিল অঘোরের মনে, সেই মূল্যবোধই যেন হেরে গেল তাঁর জেদের কাছে। এই গল্প শুরু হয়েছে রেষারেষি দিয়ে, কিন্তু রেষারেষির ফলে যে সহজাত মূল্যবোধই হারিয়ে যেতে বসেছে, সেই চিত্রই যেন এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন।

'ভূতে বিশ্বাস নেই' গল্পটি একটি রহস্যগল্প। কিন্তু এটির বিশেষত্ব হল এর লেখক যেহেতু হাসান আজিজুল হক, তাই এটি নিছক ভূতের গল্প হয়েই থেকে যায়নি। গ্রামীণ প্রকৃতি ও গ্রামীণ চিকিৎসাব্যবস্থার এক ঝলক লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখান থেকেই দেখা যায় যে সেই সময় কিছু কিছু রোগ ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থা এতই দুর্লভ ছিল যে জনসাধারণের কাছে তা রীতিমতো কৌতূহল ও দর্শনের বিষয় ছিল। লেখকের বড়চাচার রোগ যেন সেই অসুস্থ মানুষটিকে সকলের সামনে দর্শনীয় করে তুলেছিল, যা এমন অনেককেই সেই সময়ে করে তুলতো। সেই সঙ্গে তৎকালীন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 355 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময়ের ডাক্তার ও ডাক্তারির বর্ণনাও সেই সময়কার চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরে যা সত্যিই গ্রামবাংলার ভয়াবহ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মনে করায়। গ্রামে গঞ্জে অনেক সময়েই হয় হাতুড়ে ডাক্তারের কাছেই প্রাণের মায়া ছেড়ে চিকিৎসা করতে হত, আর নয়তো একটু ভালো ডাক্তারের খোঁজে মাইলের পর মাইল যাত্রা করে কোনো গ্রামের একটিমাত্র ভাল ডাক্তারকে নিয়ে আসতে হত। গল্পেও ঠিক তাই ঘটেছে এবং নতুন ডাক্তার ক্যাথিটারের মাধ্যমে যে চিকিৎসা করেছেন, গ্রামের অজ্ঞ মানুষদের কাছে সেটিও একটা দর্শনীয় বিষয়। গল্পে এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামের বেহাল যাতায়াতব্যবস্থা আর রহস্যজাল।

'গজভুক্তকপিত্থ' গল্পটিও বেশ মজার ছলেই পরিবেশিত হয়েছে। গজভুক্তকপিত্থ শব্দের অর্থ হল হাতির খাওয়া কদবেল অর্থাৎ 'অন্তঃসারশূন্য'। কথায় বলে হাতি যখন কদবেল ভক্ষণ করে সেই বেল নাকি পূর্ববৎ তার শরীর থেকে বর্জ্য হিসেবে বের হয়ে যায় কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ভেতরের বেলটি হজম হয়ে যায়। রয়ে যায় বাইরের খোলসটি। লেখক এখানে কৌতুকাবহ ভঙ্গিমায় বর্ণনা করেছেন তার বোকামির গল্প। কীভাবে নন্তু ওস্তাদ নামের একটি ধূর্ত ছেলে কেবল কথার জালে কথককে জড়িয়ে কদবেলের টোপ দিয়ে তাকে বোকা বানিয়েছিল। কদবেল কথকের অত্যন্ত প্রিয় খাবার হওয়ায় নন্তু ওস্তাদের 'কায়দা করা কদবেল' খেয়ে দেখতে রাজি হয়ে গেছিলেন কথক, তারপরেই নন্তু ওস্তাদ কদবেল খাওয়ানোর নামে তাকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য একটি কদবেল দিয়ে ঠকিয়ে দেয়। আর কথক যখন গজভুক্তকপিত্থ কথাটির অর্থ জানতে পারেন তখন তার মনে হয়— "এখন নিজেই গজভুক্তকপিত্থ হয়ে গেছি"[৭] - অর্থাৎ এতটা মূর্খামি যেন কথকের নিজেরই গজভুক্তকপিত্থ দশা অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রমাণ করে। লেখক যেন মজার ছলে শিশুদের এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে অতিরিক্ত মূর্খামি আসলে নিজের মনের ও বুদ্ধির অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রমাণ করে।

'লড়াই মানে ফাইট' গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি অনবদ্য গল্প। গল্পের নামটিই অনেক কিছু বলে দিতে সক্ষম। সত্যিই প্রতিটি মানুষকেই সারাজীবন লড়াই অর্থাৎ ফাইট করেই বাঁচতে হয়। এটি মানব জীবনের এক চরম সত্য। আর তাঁদের মধ্যে যারা স্বাভাবিক মানুষের মতো নন, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যাদের যেতে হয়, তাঁদের লড়াই বরাবরই অন্যদের তুলনায় একটু বেশি। এই গল্পে নসু লড়াই করে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে আর নসুর মা লড়াই করেন প্রতিদিনের জীবনের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। নসুর জীবনের একটাই জোর, সেটা হল –

> "ফাইট না করে আমি কোনোকিছু ছেড়ে দিই না।"[৮]

সত্যিই, এই কথা যেন কেবল নসুর না, আমাদের সবার কথা, লড়াই না করে কোনোকিছু ছেড়ে দিতে নেই। আর নসু কিন্তু কেবল নিজের লড়াইই দেখে না, সে দেখে তাঁর মায়ের নিত্যদিনের লড়াই বা ফাইটও। সে দেখে তাঁর মা কিভাবে প্রতিদিন সকলের সঙ্গে লড়াই করে, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে চেষ্টা করে প্রতিদিন বাঁচার। তারা গরীব, তারা নিঃস্ব, তাই তাঁদের লড়াই মাটি, শীত, অন্ধকার রাত, ড্রেনের নোংরা জল, যানবাহন, ক্ষুধা, কুকুর, আর সভ্য মানুষের মুখোশধারী কিছু প্রাণীর সঙ্গে।[৯] এঁর মধ্যে ক্ষুধার সঙ্গে লড়াইটিই মনে হয় মানুষের চিরন্তন লড়াই। কিন্তু নসু জীবনযোদ্ধা অর্থাৎ ফাইটার, তাই সে অবলীলায় বলতে পারে—

> "খিদের সঙ্গেও আমি ফাইট দিতে পারি।"[১০]

কিন্তু লেখক যেন আবারো ছোট্ট নসুকে বুঝিয়ে দেন যে, জীবন মানে কেবলমাত্র একার লড়াই। তাই তো, এই ফাইটে যে নসুর সবচেয়ে বড়ো সমর্থক, যে তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতো, অন্য সকলে অবহেলা করে তাকে নস্যা বলে ডাকলেও যে মা তাকে কখনো উপহাস করে ডাকেনি, সেই মা তাকে ছেড়ে চলে যায় পরপারে। লেখক হয়তো এভাবেই বুঝিয়ে দেন যে, এই যে চিরকালীন ফাইট, এটা কোথাও গিয়ে শেষ পর্যন্ত একাকেই লড়তে হয়। এই গল্পটি কেবল নসুর নয়, এই গল্প আমাদের সকলের। এই গল্প কেবল শিশুদের নয়, এই গল্প শিশু থেকে বড় সকলের।

এর পরে আরেকটি অসাধারণ গল্প হল 'চরু'। এই গল্পে চরু কোনও মানুষ নয়, সে হল একটি হরিণছানা। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে চরু নিজের চেনা জায়গা, নিজের সবুজ বন থেকে শিকড় উপড়ে চলে আসে লোকালয়ে, কিছু মানুষ তাঁর মাকে মেরে তার সঙ্গে চরুকেও নিয়ে আসে, অবশ্যই পোষার উদ্দেশ্যে নয়, বরং বড় হলে তাকেও মাংসের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 355 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জন্য হত্যা করা হবে সেই মানসে। তার চোখের সামনেই মা হরিণের মাংস চলে যায় বিক্রির উদ্দেশ্যে। সন্তান হয়ে মায়ের এই পরিণতি চোখের সামনে দেখা যে কী পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক তা সহজেই অনুমেয়। পাঠক ওই অংশটি পাঠ করতে গিয়ে ভুলে যাবেন যে চরু একটি হরিণশিশু মাত্র, মানুষ নয়। চরু বোঝে বনের চেয়েও ভয়ানক প্রাণী বনের বাইরে বাস করে। লোকালয়ে আসার পরেই চরুর জীবন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের খাতে বইতে থাকে, যে চরু তার চারপাশে একদিকে দেখে তার দেহের মাংসলোলুপ একদল মানুষকে ঘুরে বেড়াতে, যারা তাঁর মুখে খাদ্য দিতে চায়, তাকে যত্ন করতে চায় শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, আর একদিকে সে দেখে একটি ফরসা মূক-বধির ছেলেকে, যে কিনা সত্যিই তাকে ভালোবাসে, চরু যখন কোনও খাবার গ্রহণ করার মতো মানসিক অবস্থায় ছিল না, সেই ছেলেটি কোনও রকম উদ্দেশ্য না রেখে কেবল চরুকে ভালোবেসেই তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে। লেখক কিন্তু আসলে দ্রষ্টাও হন। তিনি জানেন যে যারা শিশুদেরকে ভালবাসে, শিশুরা তাঁদের ঠিক চিনে নেয়। যেমন চরু ও বোবা কালা ছেলেটি চিনে নিয়েছে পরস্পরকে। আর সত্যিই এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এমন কিছু শিশু আছে বলেই পৃথিবী এখনো সুন্দর। কাহিনির শেষ টুইস্ট এখানেই হয়, যখন চরু আর ছেলেটির বন্ধুত্ব এক ভয়ানক পরীক্ষার মুখে পড়ে, কারণ, ছেলেটির বাড়ির লোকের কাছে তো চরু মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই তারা তাকে মেরে ফেলতে উদ্যোগী হয়, আর এখানেই একটি সরল বোবাকালা ছেলের সহানুভূতি ও ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয় একদল লোভী মানুষ তথা লোভাতুর সমাজ, যাঁদের অভিধানে হয়তো সহানুভূতি শব্দটি নেই। লেখক এটিও বুঝিয়েছেন যে, যে মানুষটি সমাজের চোখে কোনোভাবে প্রতিবন্ধী, বড় কিছু করার সাধ্য তাঁর নেই, কিন্তু সময় আসলে সেই মানুষটিই কতটা 'Heroic' কাজ করে উঠতে পারে, চরুকে বাঁচাতে ছোট্ট ছেলেটির কার্যকলাপ সেই ইঙ্গিতই দেয়। আর এই বোবা-কালা হওয়াটাও একটি প্রতীক। সমাজে স্রোতের বিপরীতে গিয়ে কোনও ভাল কাজ করতে হলে সুস্থ মানুষেরও একটু মূক-বধির হওয়াই হয়তো শ্রেয়, সকলের কথা শোনা ও তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন সবসময় পড়ে না।

> "সূর্যের আলো পড়েছে ছেলেটার মুখে"[১১]

- এই আলো আসলে ভালো মানুষের পবিত্রতার আলো, যা চরু আর ছেলেটিকে এক করে দিয়েছে। এই খারাপ সমাজে যে এখনও কিছু পরিমাণ ভাল মানুষ রয়েছে, যারা কিনা এই খারাপ সমাজের খারাপ মানুষদেরই সমান্তরালে আলোর মতো অবস্থান করে, 'চরু' যেন তারই প্রমাণ। এই কাহিনি ছোটো বড় সকলের জন্য প্রেরণাদায়ক।

শেষ গল্প 'ব্যাঘ্রবধের ব্যাপার'। এই গল্পটিও অত্যন্ত মজার ছলে লেখা। আমাদের সবার পাড়াতেই যেমন একটি দাদাগোছের মানুষ থাকেন যিনি সব ব্যাপারে সকলের পুরোভাগে যেতে চান, এখানেও এমন একজন আছেন যার নাম মস্তানভাই। নাম এত ভারিক্কি হলেও মস্তানভাই আদৌ মস্তানের মতো কি না, তা কাহিনিতেই স্পষ্ট। সেই মস্তানভাই গ্রামে উপদ্রবকারী একটি বাঘকে ধরার জন্য তাঁর অনুগামী ছেলেদের একটি দল তৈরি করে সদলবলে বাঘ ধরতে জঙ্গলে যান। সেই বাঘ মারার তোড়জোড় থেকে শুরু করে, মস্তানভাই আদৌ বাঘ মারতে পারলেন কি না, কৌতুকাবহ কাহিনিটি এই নিয়েই এগিয়ে চলতে থাকে। কাহিনিটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে পড়বেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা চরিত্র ও তার তিন সহযোগীর কীর্তিকলাপের কথা, বিশেষ করে 'চারমূর্তির অভিযান' নামক উপন্যাসের কথা যেখানে তারা সকলে বাঘ শিকারে গিয়েছিল। গল্পটির ছত্রে ছত্রেই হাসির উপাদান বিদ্যমান। যারা বাঘ মারার মতো সিরিয়াস একটি কাজ করতে যাচ্ছে, তাদের বাঘ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই। ধারণা এতই অস্পষ্ট যে, বাঘ সম্পর্কে জানতে তাদের বইয়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাই, এই অভিযানের অন্যতম সদস্য ক্লাস নাইনে পড়া রাহা নামের একটি ছেলের—

> "এক হাতে রচনা বই- মিলিয়ে দেখবে বলে, অন্য হাতে দা।"[১২]

কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যদিকে মোড় নেয় যখন দেখা যায় বাঘ মারা গেছে শিকারি মফিজ সাহেবের হাতে, বাক্যবাগীশ মস্তানভাই আগেই মূর্ছা গেছেন। কিন্তু আসল ক্ষতি হয় মফিজ সাহেবের সহকারী মাধাইয়ের, বাঘের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বাঘ তার মুখের ডানপাশ চিরস্থায়ীভাবে মারাত্মক জখম করে। মাধাইয়ের জন্য সমবেদনার ও মস্তানভাইয়ের দুর্দশার সুন্দর কৌতুক-কাহিনি এটি।

কিশোরদের জন্য যে একটিই মাত্র উপন্যাস হাসান আজিজুল হক লিখেছেন সেটি হল ‘লাল ঘোড়া আমি’ উপন্যাস। এটিকে একটি ঘোড়ার আত্মজীবনীও বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে এই ধরনের বইকে ‘fictional pony book’[১৩] বলা হয়। ইংরেজ লেখিকা আনা সুয়েল রচিত ‘Black Beauty’ (১৮৭৭) উপন্যাসটিও এমনই একটি ঘোড়ার আত্মকথা[১৪]। ‘লাল ঘোড়া আমি’ উপন্যাসে একটি ঘোড়ার জবানিতে কেবলমাত্র তার জীবনকাহিনীই বর্ণিত হয়নি, তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও মানুষের চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী শুনতে শুনতে ঘোড়াটিকে কেবল ঘোড়া বলে আর মনে হয় না, সে যেন শোষিত মানুষদের এক প্রতীক। পুরো উপন্যাস জুড়ে ঘোড়াটি বর্ণনা করেছে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, তার চোখের সামনে হয়ে যাওয়া অনেক ঘটনার। সে দেখেছে, মানুষ নামক প্রজাতি, আর যাই করুক, তার চোখে কখনো ভালো হয়ে উঠতে পারেনি। সে কখনো মানুষদের বিশ্বাসের চোখে দেখতে পারেনি। অবশ্য, যে মানুষরা শিশু অবস্থায় লাল ঘোড়ার থেকে তার মাকে আলাদা করে বেচে দিয়েছিল, তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারা সত্যিই কঠিন। যাই হোক, উপন্যাসে কৌতুক আছে, আছে আর্দ্রতা। আছে এমন কিছু দিক, যা পড়লে উপন্যাসটিকে ঠিক শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা বলে মানতে কষ্ট হবে। যেমন - গরীব প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচার বা জমিদারের শেষ পরিণতি। ঠিক শিশু-কিশোরদের জন্য উপযোগী এই বর্ণনাগুলি নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই উপন্যাসের লেখক হলেন হাসান আজিজুল হক। যাঁর লেখার নীতিই হল, পাঠককে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করানো, কল্পরাজ্যে বিচরণ করিয়ে নিছক বিনোদন দেওয়া নয়। ফলতঃ তাঁর কিশোর পাঠকদের জন্যও যে একই নীতি প্রযোজ্য হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। মানুষের ক্রূর রূপটি যে ঠিক কেমন, এই চিত্রগুলির মাধ্যমে পাঠকদের সেই বার্তাই দিয়েছেন লেখক। আর, আরও একটু গভীরে গিয়ে যদি ঘোড়াটিকে পশুর বদলে শোষিত সমাজের মূক প্রতিনিধি ভাবা যায়, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত হয়েই ধরা দেবে। সত্যিই, ঘোড়াটি যে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, শোষিত মানুষেরা মনে হয় সেই সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যায়। ঘোড়া হয়েও সে কিন্তু নিজেদের ঘোড়া সমাজের কথা বর্ণনা করেনি, করেছে মানুষ সমাজের বর্ণনা। উপন্যাসে, বারবার ঘোড়াটির হাতবদল ঘটেছে, সে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, তাঁদের আসল রূপ, লোভ, হিংসা, লালসা, দ্রোহ দেখেছে। সে দেখেছে, টাকা নামক একপ্রকার কাগজের টুকরোকে মানুষ কতটা ভালোবাসে। কিন্তু, তাঁদের সকলের মধ্যে, যাঁদেরকে সে উপেক্ষা করতে চেয়েও পারেনি তারা হল হাশেম নামের একটি ছেলে ও তার মা। মানুষের প্রতি তীব্র অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হাশেম ও তার মায়ের ভালোবাসা ঘোড়াটিকে আসল ভালোবাসার মূল্য বুঝিয়েছে। তাই মৃত্যুর সময়েও হাশেম ও তার মায়ের কথাই মনে পড়ে ঘোড়াটির, কারণ এই ভালবাসা সে নিজের মা ছাড়া আর কোথাও পায়নি। লেখক দেখিয়েছেন চরম অবিশ্বাসও ভালোবাসার কাছে হেরে যায়। হাশেম ও হাশেমের মা-ই তার প্রমাণ। এভাবেই যেন একটি ঘোড়ার জবানিতেই মানুষের জীবনের ভালবাসা, লোভ, হিংসা, দ্রোহ সবকিছুর কাহিনি শুনিয়ে দিয়েছেন হাসান আজিজুল হক, তার কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের।

পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, শিশু-কিশোরদের জন্য হাসান আজিজুল হকের রচনা হয়তো খুবই সীমিত, কিন্তু, যতটুকুই তিনি তাঁদের জন্য লিখেছেন, বিনোদনের পাশাপাশি একটি বাস্তবতার আয়নাও তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে তারা আনন্দ তো পায়ই, তার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে বাস্তবতাকেও বোঝে। একজন সিরিয়াস বিষয়ের লেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হক একদিকে যেভাবে শিশু-কিশোরদের অবস্থানে নেমে এসে তাদের মতো করে গল্প রচনা করেছেন, আবার তাতে বাস্তবতারও স্পর্শ দিয়েছেন, হাসান আজিজুল হকের মতো সমাজ সচেতন লেখকের কাছে, এটিই হয়তো কাম্য।

Reference:

১. হক, হাসান আজিজুল, ‘হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ’, তৃতীয় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৩৬১

২. তদেব, পৃ. ৩৬১

৩. তদেব, পৃ. ৩৬১

৪. রায়, সুকুমার, ‘সুকুমার রচনা সমগ্র’, সম্পাদনা- গীতিকণ্ঠ মজুমদার, লতিকা প্রকাশনী, ১৪৩০, পৃ. ১৯৪

৫. হক, হাসান আজিজুল, ‘হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ’ তৃতীয় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৩৬২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 355 - 361
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৩৬৯
৭. তদেব, পৃ. ৩৭৮
৮. তদেব, পৃ. ৩৭৯
৯. হোসেন, মোজাফফর, 'হাসান আজিজুল হক-এর শিশু-কিশোর সাহিত্য', গল্পকথা পত্রিকা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩ (২০১২) পৃ. ২৮৫
১০. হক, হাসান আজিজুল, 'হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৩৮২
১১. তদেব, পৃ. ৩৮৭
১২. তদেব, পৃ. ৩৯১
১৩. হোসেন, মোজাফফর, 'হাসান আজিজুল হক-এর শিশু-কিশোর সাহিত্য', গল্পকথা পত্রিকা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩ (২০১২) পৃ. ২৮০
১৪. তদেব, পৃ. ২৮০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড)
রচনাবলি ১ – হাসান আজিজুল হক

সহায়ক গ্রন্থ :
গল্পকথা পত্রিকা - হাসান আজিজুল হক সংখ্যা
সুকুমার রচনা সমগ্র, সম্পাদনা - গীতিকণ্ঠ মজুমদার